বেঙ্গল টাইমস

১৫ আগস্ট, ২০২৩

ISSN 2445-5657

bengaltimes.in

সূচিপত্র

উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্যাসী
❑ জগবন্ধু চ্যাটার্জি

এপার বাংলায় উল্লাস, ওপার বাংলায় কান্না
❑ দিব্যেন্দু দে

স্বাধীনতার আড়ালে অন্য এক ১৫ আগস্ট
❑ ময়ূখ নস্কর

না বোঝা সেই স্বাধীনতাটাই ঢের ভাল ছিল
❑ অন্তরা চৌধুরি

ছিল হাসির গান, হয়ে উঠল প্রার্থনা সঙ্গীত
❑ স্বরূপ গোস্বামী

মোহনবাগানের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল তারিখটা
❑ সোহম সেন

বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, নেতাজিকে চেনেন!
❑ সুমিত চক্রবর্তী

বিনোদন

দর্শক সহযাত্রী হয়ে উঠল কই?
❑ রঞ্জন ভট্টাচার্য

সাহিত্য

পুজো সংখ্যায় এত তাড়াহুড়ো কেন?
❑ অমিত ভট্টাচার্য

বুক প্রিভিউ

পরিচালকদের কাজটা আশি ভাগ এগিয়ে রাখল ‘নিয়তি’
❑ স্বরূপ গোস্বামী

খেলা

টিকিটের লাইন দেখে গর্বিত নয়, লজ্জিত হতে শিখুন
❑ ধীমান সাহা

ভ্রমণ

গোলপাহাড়ের টিলায় বসে..
❑ শ্যামল মুখার্জি

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কে বি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, ই-মেল: bengaltimes.in@gmail.com

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস মানে কী? খুব ছোটবেলায় মনে হত, নিছক একটি ছুটির দিন। সেইদিন পড়াশোনা নেই। বাড়ির বকাঝকা নেই। যা খুশি করা যায়। এখনও কি সেই ধারণা খুব বেশি বদলেছে? শনি, রবি ছুটির দিনের পর যদি সোমবার পড়ে, তাহলে তো কথাই নেই। দিঘা বা দার্জিলিংয়ের সেই উপচে পড়া ভিড়। এবার স্বাধীনতা দিবস মঙ্গলবার। মাঝে সোমবারটা সিএল নিলেই লম্বা ছুটির আবহ তৈরি। শুধু কাতারে কাতারে দিঘায় জমায়েতের অপেক্ষা।

স্বাধীনতা মানে একঝাঁক গুরুগম্ভীর বিতর্কও হাজির হয়ে যায়। অহিংস পথে নাকি জঙ্গি আন্দোলনে, কোন পথে এসেছে এই স্বাধীনতা? কার কতটা অবদান? একজনকে মহান দেখাতে গিয়ে আরেকজনকে অহেতুক ছোট দেখানোর ট্র্যাডিশনটাও বেশ পুরনো। ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়–এই জাতীয় কথা এখন আর শোনা যায় না ঠিকই, তবে আক্ষেপ করে কেউ কেউ বলেন, এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলাম? আবার কেউ কেউ ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে আরও সুন্দরভাবে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে।

বেঙ্গল টাইমসের এই সংখ্যায় গুরুগম্ভীর পর্যালোচনা নয়। বরং, দু–একটা অন্যরকম বিষয়ে আলো ফেলার চেষ্টা। স্বাধীনতার সেই পুণ্যলগ্নে কোথায় ছিলেন গান্ধীজি? ১৫ আগস্ট দিনটিতে স্বাধীনতার আড়ালে আরও কোন কোন ঘটনা চাপা পড়ে থাকে? বাংলাদেশের কাছে দিনটা কেনই বা কান্নার স্মৃতি বয়ে আনে? স্বাধীনতা দিবসের অনিবার্য গান কীভাবে তৈরি হয়েছিল? এমনই টুকরো টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু বিষয়। সঙ্গে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

শারদোৎসব দরজায় কড়া নাড়ছে। চলছে পুজো সংখ্যার প্রস্তুতিও। পাঠকের জন্যও অবারিত দ্বার। আপনিও পাঠিয়ে দিন আপনার পছন্দের লেখা।

উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী

জগবন্ধু চ্যাটার্জি

ভারত যেদিন স্বাধীন হয়, সেদিন কোথায় ছিলেন গান্ধীজি? উত্তরটা হল, কলকাতায়। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বেলেঘাটায়।

লালকেল্লায় যখন স্বাধীনতার উৎসব হচ্ছে, গোটা দেশে যখন পতপত করে তেরঙা উড়ছে, তখন স্বেচ্ছা নির্বাসনে জাতির জনক। উৎসব আর কোলাহল থেকে অনেক দূরে। তিনি তখন দুই সম্প্রদায়কে আরও কাছাকাছি আনার সাধনায় মগ্ন।

দেশ বিভাজনের মধ্যে দিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। মন থেকে তা মেনে নিতে পারেননি গান্ধীজি। সেই যন্ত্রণার কথা দ্ব্যর্থহীনভাষাতেই বারবার বলেছেন। স্বাধীনতার আগের দিন, অর্থাৎ ১৪ আগস্ট কলকাতার মারওয়াড়ি ক্লাবে গান্ধীজি

বলেছিলেন, ‘কাল ইংরেজ শাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব। কাল থেকে আমরা স্বাধীন। কিন্তু আজ রাত থেকে আমার ভারত দু টুকরো হয়ে যাবে।’

তার কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, ‘আমার দেশ আনন্দ করবে। আমি চাই, আপনারাও আনন্দ করুন। কিন্তু আমি সেই আনন্দযজ্ঞে সামিল হতে পারব না। কারণ, এমন স্বাধীনতা তো আমরা চাইনি। এই স্বাধীনতা আগামীদিনে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে বিভাজনের বীজ পুঁতে যাবে। এই অবস্থায় আমি কী করে মশাল জ্বালাতে পারি?’

দেশের নানাপ্রান্তে শুরু হয়ে গেল হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গা। একদিকে নেতারা ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারায় মগ্ন। অন্যদিকে এক সম্প্রদায়ের হাতে মরছে আরেক সম্প্রদায়ের নীরিহ মানুষ। গান্ধীজি ১৩ আগস্ট এলেন বেলেঘাটায়। কারণ, এখানে দুই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে মিলেমিশে আছে। গান্ধী এমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে গোটা দেশকে এক সম্প্রীতির বার্তা দিতে চাইলেন। মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, ‘পাঞ্জাবে দাঙ্গা চলছে। সেখানে দাঙ্গা থামাতে আমরা ৫৫ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছি। বাংলায় শুধু একজন। ওয়ান ম্যান আর্মি। সেই মানুষটা একাই প্রাচীর হয়ে দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছে।’

পনেরোই আগস্ট সেই মানুষটা কোথাও যাননি। বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমে প্রার্থনা করে গেছেন আর একা একা চরকা কেটেছেন। না, সারাদিন কিছুই মুখে তোলেননি। উৎসব থেকে দূরে, একাকী এক সন্ন্যাসী।

এপার বাংলায় উল্লাস ওপার বাংলায় কান্না

দিব্যেন্দু দে

আমাদের কাছে পনেরোই আগস্ট মানে স্বাধীনতা দিবস। আনন্দের দিন। কিন্তু পাশের দেশে ছবিটা অন্যরকম। সেখানে পনেরোই আগস্ট মানে মর্মান্তিক এক হত্যাকান্ড। পনেরোই আগস্ট মানেই ভয়াবহ সেই স্মৃতি। পনেরোই আগস্ট মানে যন্ত্রণার দিন, কান্নার দিন।

১৯৭৫ সালের এই দিনেই নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে। শুধু তাঁকে হত্যা করেই থেমে থাকেনি জহ্লাদরা। মুজিবের স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই পুত্র-বধুকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করল বাংলাদেশ। নতুন রাষ্ট্রের রূপকার বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের রাস্তায় হেঁটে দেশের নতুন সংবিধান চালু করলেন। আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় কড়া হাতে তা দমন করতে চাইলেন। কিন্তু সেনাবাহনীর একটা অংশ তলায় তলায় ষড়যন্ত্র করেই চলেছিল। ঠিক ছিল, পনেরোই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে যাবেন বঙ্গবন্ধু।

আগের রাত থেকেই তৈরি হয়েছিলেন সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্তা। সঙ্গে পেয়েছিলেন আওয়ামি লিগের বিক্ষুব্ধ কিছু নেতাকে। তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা। মুজিবের ধানমন্ডির বাড়ি ঘিরে ফেলে

ঘাতকরা। ষড়যন্ত্র করে আগে থেকেই জাল বিছোনো ছিল। ফলে, তেমন বাধার মুখেও পড়তে হয়নি। ঢোকার মুখেই পেয়ে যায় মুজিব–পুত্র শেখ কামালকে। প্রথমেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হল। বঙ্গবন্ধুকে বলা হল ক্ষমতা ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পালাতে। ভাবার জন্য কিছুক্ষণ সময় দেওয়া হল। বঙ্গবন্ধু ফোনে ডাকলেন কর্নেল জামিলকে। জামিল এসে হামলাকারি সেনাদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ঘাতকেরা জামিলের কথাও শুনল না। উল্টে গেটের মুখে তাঁকেও গুলি করল। এরপর তারা মুজিবকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। মুজিব তা মানতে অস্বীকার করেন। তখন সিঁড়িতে ওঠার মুখে পেছন থেকে তাঁকেও গুলি করা হয়। মুজিবকে লক্ষ্য করে সবমিলিয়ে ৩৫ টি গুলি ছোঁড়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুজিব লুটিয়ে পড়লেন। মুজিবের স্ত্রী তখন বলেন, আমাকেও তোমরা মেরে ফেল। তাঁর স্ত্রীর দিকে গুলি চালাতেও হাত কাঁপেনি দস্যুদের। মুজিব পুত্র শেক জামাল ও দুই পুত্রবধূকে খুঁজে বের করে খুন করা হল। দশ বছরের ছোট্ট ছেলে রাসেও নিস্তার পেল না মৃত্যুর হাত থেকে।

বেঁচে গিয়েছিলেন দুজন। মুজিবের দুই কন্যা। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। তাঁরা দুজনেই তখন ছিলেন জার্মানিতে। সেই হাসিনা এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে আজও পনেরোই আগস্ট পালন করা হয়। যে দিনটা আমাদের কাছে উল্লাসের, সেটাই ওপার বাংলায় কান্নার।

স্বাধীনতার আড়ালে অন্য এক ১৫ আগস্ট

স্বাধীনতা দিবসের কথা সবাই জানি। কিন্তু তার আড়ালে আরও কতকিছু চাপা পড়ে রইল। এই পনেরোই আগস্ট যে আরও অনেককিছু। সবদিকেই আলো ফেললেন ময়ূখ নস্কর।

ভারত হয়তো নব্বই বছর আগেই স্বাধীন হয়ে যেত। হল না এক সর্বনেশে ১৫ আগস্টের জন্য।

১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট পূর্ব ভারতে চালু হল রেল চলাচল। প্রথম দফায় সেই রেলের যাত্রাপথ ছিল হাওড়া থেকে হুগলী। মধ্যপথে রেল থেমেছিল বালি, শ্রীরামপুর আর চন্দননগরে। এর এক বছর আগেই বম্বে থেকে থানে রেল চালু হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার লাগোয়া হাওড়ায় রেল যোগাযোগ চালু হওয়ার গুরুত্বই ছিল আলাদা। দেশ জুড়ে রেলপথ পাতার সুবিধা ইংরেজরা পেয়েছিল কয়েক বছর পরে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সেনা পাঠাতে পেরেছিল। আধুনিক প্রজুক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিদ্রোহী সিপাহিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দেশ স্বাধীন হল না বটে, কিন্তু ভারতের সমাজ জীবনের খোল নলচে বদলে দিল রেল। এই পরিবর্তনের তার বিবরণ পাওয়া যায় রমাপদ চৌধুরির "প্রথম প্রহর" উপন্যাসে। প্রথম প্রথম সবাই ভেবেছিল "ও গাড়িতে উঠলে জাত যাবে সকলের। বামুন বাগদির তফাত নেই, সব গায়ে গা দিয়ে নাকি বসতে হয়।" সবাই ভেবেছিল, ওই গাড়ির জন্যই নাকি কলেরার মড়ক লেগেছে। তারপর আস্তে আস্তে প্রয়োজনের তাগিদে কুসংস্কার উড়ে গেল। "তারপর ক্রমশ দেখা গেল গ্রামের মেয়েরা রেলগাড়ির পুজো করে ঘরে ঘরে, রেলের দৌলতেই নাকি দুর্ভিক্ষ গেছে দেশ থেকে, খেয়ে পরে বেঁচেছে তারা। "

মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন করে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হতে হয়তো কিছু দিন দেরি হতো। কিন্তু তার গতি দ্রুত করল দুটি পৃথক ১৫ আগস্ট।

১৮৭২ সালে কলকাতার ঘোষ পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন শ্রী অরবিন্দ। ১৫ আগস্টের জাতক এই ছেলেই একদিন আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবেন, ব্রিটিশের গোলামি করবেন না বলে। বরোদা-রাজের চাকরি ছেড়ে যোগ দেবেন সশস্ত্র সংগ্রামে। তাঁর হাত ধরেই বাঙলার মাটিতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটবে। উত্তরকালে সক্রিয় রাজনিতি থেকে আধ্যাত্মিকতায় সরে গেলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে

অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর অবদান। এসবের মধ্যেই ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতায় স্থাপিত হয় মোহনবাগান ক্লাব। এই ক্লাবের সঙ্গে ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতন। যে বছর ক্লাব প্রথম আই এফ এ শিল্ড জিতল সেই ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ হল। কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হল দিল্লিতে।

ক্লাবের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেল নানা মিথ। ঐতিহাসিক শিল্ড জয়ের পর, এক সমর্থক নাকি ফোর্ট উইলয়ামের মাথায় উড্ডীন ইউনিয়ন জ্যাকটিকে দেখিয়ে বলেছিল, ‘শিল্ড তো জিতলে, ওটাকে নামাবে কবে?’ উত্তর এসেছিল, ‘যেদিন আবার শিল্ড জিতব সেদিন।‘ কাকতালীয় হলেও মোহনবাগান দ্বিতীয়বার শিল্ড জিতল ১৯৪৭ সালে, আর সেই বছরেই স্বাধীন হল দেশ। বলা বাহুল্য ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস ১৫ আগস্ট।

১৫ আগস্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও কিছু জন্ম ও মৃত্যু। ১৯২৬ সালে কলকাতার কালিঘাটে মামাবাড়িতে যিনি পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, অনেকেই মনে করেছিলেন তিনি কালে কালে রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের উত্তরসূরি হয়ে উঠবেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও বহুদিন সক্রিয় থাকবে তাঁর কলম। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৩ মে .....

“যাদবপুরের মাঠে শিরীষের ছায়া দীর্ঘ হয়
বেলা পড়ে আসে, দেখি মেঘ আনে পরম
বিস্ময়।’’

যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে বিদায় নিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য।

বিদেশের দিকে চোখ ফেরালে দেখি, ১৭৬৯ সালে এই দিনেই জন্মেছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন।

তবে ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশি বাংলাদেশে যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি নজির আছে তাকে এককথায় নোংরামি বলা যায়। এপার বাংলা হোক বা অপার বাংলা- ১৫ আগস্ট মানে তো শুধু স্বাধীনতা নয়- ১৫ আগস্ট মানে দেশভাগের স্মৃতি, ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি। সেই ১৫ আগস্টের গায়ে আরও এক পোঁচ রক্ত লেগেছিল ১৯৭৫ সালে। সেদিন ভোরে ভারত যখন স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে মত্ত, তখন সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে চলছে নারকীয় হত্যালীলা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাসস্থানে চড়াও হয়েছে বিদ্রোহী সেনারা। আততায়ীদের নির্বিচার গুলিতে শেষ হয়ে গেল গোটা পরিবার। সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়লেন শেখ মুজিব। নিহত হলেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র কামাল, জামাল এবং রাসেল। রাসেলের বয়স তখন মাত্র দশ। বিদেশে থাকায় বেঁচে গেলেন দুই কন্যা হাসিনা এবং রেহানা।

বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা হয়। কিন্তু গোলমাল পাকালেন জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি জানালেন, ১৫ আগস্ট তাঁর জন্মদিন, অতএব ওই দিন তাঁর সমর্থকরা আনন্দ উৎসব করবেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগের ত্রফে বেগম খালেদার এই আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়। খালেদার বিরোধীরা বলেন, ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী, খালেদার জন্মদিন ৯ আগস্ট ১৯৪৫। বিবাহ সার্টিফিকেট অনুযায়ী, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। পাসপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ আগস্ট ১৯৪৫। ১৫ আগস্ট জন্মদিনের সপক্ষে কোনও প্রমান নেই।

বিশ্বের ইতিহাসে আরও চোখ বলালে দেখা যাচ্ছে, শুধু ভারত নয়, আরও অনেক দেশেরই স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্ট। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপানের কবল থেকে স্বাধীন হয়েছিল কোরিয়া, ১৯৪৮-এর এই দিনেই দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। ১৯৬০ সালের এই দিনেই ফ্রান্সের অধীনতা থেকে স্বাধীন হয়েছিল রিপাবলিক অফ কঙ্গো, ১৯৭১ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল বাহরিন।

এবং ভারত। ১৫ আগস্ট স্বাধীন হওয়া দেশগুলির তালিকায় কিন্তু ভারতের নাম থাকার কথাই ছিল না। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এটলি ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু তার বদলে ভারত যে '৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীন হল, তার জন্য দায়ী ছিল আর এক ১৫ আগস্ট। ১৯৪৫ সালের এই দিনেই মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল জাপান। শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ৬ আগস্ট হিরোশিমা আর ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর জাপানের পক্ষে আর লড়াই চলান সম্ভব ছিল না। ইংরেজরা হয়তো চেয়েছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত জাপানের মতই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ফেলে রেখে যাবে ভারতকে। তাই হাতে এক বছরেরও বেশি সময় থাকলেও নতুন ভাইসরয় মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারত ছেড়ে বিদায় হবে ইংরেজ। সঙ্গে হবে দেশভাগ। দেশ যে ভাগ হবেই তা অবশ্য এক বছর আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬-এর ১৫ আগস্টের রাতে ভারতবাসী ধর্মের নামে নিজের নিজের অস্ত্রে শান দিয়েছিল। পরদিন শুরু হয়েছিল ভাইয়ের রক্তে হোলি খেলা। তেলের শিশির মতো ভেঙ্গে গিয়েছিল আমাদের দেশ।

এত বছর পরেও যখন ১৫ আগস্টের কথা ওঠে, আমরা ভুলতে পারি না, ভাঙনের পথে এসেছিল আমাদের স্বাধীনতা, তার গলায় দুলেছিল রক্তমণির হার।

না বোঝা সেই স্বাধীনতাটাই ঢের ভাল ছিল

অন্তরা চৌধুরি

ছোটবেলায় স্বাধীনতা দিবস কাকে বলে অত বুঝতাম না। স্কুলে সেদিন ক্লাস হবে না। কিন্তু ভোরবেলায় উঠে একবার স্কুল যেতে হবে। কারও খালি হাতে যাওয়া চলবে না। সবাইকেই বাড়ি থেকে অল্প করে হলেও ফুল নিয়ে যেতে হবে। স্বাধীনতা দিবস মানে আরও পাঁচটা ছুটির দিনের মতই। আলাদা কোনও বিশেষত্ব ছিল না।

ভোরবেলায় উঠে একটা প্লাস্টিকে অনেক রকম ফুল নিয়ে স্কুলে যেতাম। হেডমাস্টার মশাই নির্দিষ্ট সময়ে পতাকা উত্তোলন করতেন। পতাকার ভেতরে থাকত হরেকরকম ফুল। সেগুলো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ত। শিশুমন অবাক হয়ে যেত। তারপরেই হত জাতীয় সঙ্গীত। বন্দেমাতরম শ্লোগান। কী বলছি, কেন বলছি অত বুঝতাম না।

স্যাররা সবাই বক্তৃতা দিতেন। এক কান দিয়ে ঢুকত এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। শুধু ভাবতাম, কতক্ষণে চকলেট দেবে! সবশেষে চকলেট বিতরণের পালা। তখনকার দিনে বাংলা পাঁচের মতো দেখতে একরকম চকলেট পাওয়া যেত। সেই চকলেট সকলকে চারটে করে দেওয়া হত। সেই চারটে চকলেট নেবার জন্য সে কী আকূল প্রতীক্ষা! একটা খেতে খেতে আসতাম। আর বাকিগুলো হাতে ধরাই থাকত বাড়ি গিয়ে খাব বলে। কিন্তু বাড়ি যখন পৌঁছতাম তখন সেগুলো প্রায় গলে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট হাতে চকলেটের ঝোল। ইস! এখন ভাবলে কেমন লাগে।

আরেকটু উঁচু ক্লাসে তখন দিত লুচি, আলুর-দম আর বোঁদে। বিচ্ছু ছেলের অভাব কোনও কালেই আমাদের সমাজে ছিল না। সবাই খেয়ে দেয়ে নিজেদের মধ্যে শ্লোগান দিতে দিতে বাড়ি যেত-

‘বন্দেমাতরম বোঁদে খেয়ে পেট গরম’।

আমরা মুখ টিপে সবাই হাসতাম। এদের মধ্যে কিছু একেবারে বখে যাওয়া ছেলে ছিল।

তারা আবার আরেককাঠি ওপরে শ্লোগান দিত-

‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা
ছাগলের পঁচিশটি বাচ্ছা
আআআআআআআআআ’

নিছক মজা। কাউকে অসম্মান করার জন্য তারা নিশ্চয় এসব বলত না। কী ভালই না ছিল না বুঝে পালন করা সেই স্বাধীনতা দিবস! মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই না বোঝার দিন-গুলোই বোধ হয় ভাল ছিল। কেন যে বেশি বুঝতে গেলাম!

মোহনবাগানের সঙ্গেও জড়িয়ে গেল তারিখটা

সোহম সেন

মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি তারিখ। নিশ্চয় প্রথমেই ২৯ জুলাইয়ের কথা মাথায় আসছে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, এই দিনটিকেই মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনই ধুমধাম করে নানা অনুষ্ঠান নয়। এই দিনই মোহনবাগান রত্নও দেওয়া হয়। এই দিনেই প্রাক্তন-বর্তমানের পুনর্মিলন হয়।

কিন্তু গুগল বাবাজির সাহায্যে একবার মোহনবাগানের পেজে ঢুকুন। দেখবেন ১৫ আগস্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস। অথচ, দিনটার কথা অনেকেই জানেন না। খোদ মোহনবাগানের সদস্য-সমর্থকদেরও অনেকেই জানেন না এই তারিখটির অস্তিত্বের কথা। আসলে, কাগজ-কলমে যতই দিনটিকে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, এই দিনটির সঙ্গে মোহন-জনতার নাড়ির সেই যোগসূত্র কখনও তৈরিই হয়নি।

তাহলে, কীভাবে এল এই ১৫ আগস্ট? নানা গল্প চালু আছে। তবে সবথেকে বেশি যে কারণটা শোনা যায়, তা হল, এই তারিখটি মোহনবাগান সভাপতি ধীরেন দে-র তৈরি করা। মোহনবাগানের শতবর্ষ পালন হয়েছিল বেশি ঘটা করেই। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে। তিনি এসেওছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে মোহনবাগানকে জাতীয় ক্লাব বলে উল্লেখ করেন। শোনা যায়, সেই থেকেই নাকি জাতীয় ক্লাব শব্দদুটো মোহনবাগানের সঙ্গে জুড়ে যায়।

আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। প্রধানমন্ত্রীকে

যখন আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তখন ধীরেন দে-কে বলা হয়েছিল, কবে ক্লাব প্রতিষ্ঠা হয়, সেই তারিখ লিখতে। সত্যিই তো দিনক্ষণ দেখে এই ক্লাব তৈরি হয়নি। ঘটনা করে প্রতিষ্ঠাও হয়নি। তাই বিশেষ কোনও দিনকে চিহ্নিত করা মুশকিল। তখন ধীরেন দে বুদ্ধি করে প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে লিখে দিলেন ১৫ আগস্ট তারিখটা। সেই থেকে এই তারিখটাই থেকে গেল প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে।

ছিল হাসির গান, হয়ে উঠল প্রার্থনা সঙ্গীত

স্বরূপ গোস্বামী

পাড়ায় আজকাল আর মাইক বাজে না। রেকর্ডের যুগ তো কবেই ফুরিয়েছে। ক্যাসেটও যেন লুপ্তপ্রায় প্রজাতি। তবু গান কিন্তু থেমে নেই। নানা বিবর্তনের পরেও নানা উপলক্ষে সে ঠিক বেজে ওঠে। সে পঁচিশে বৈশাখ হোক বা পয়লা জানুয়ারি। সে ছাব্বিশে জানুয়ারি হোক বা পনেরোই আগস্ট।

আচ্ছা, পনেরোই আগস্ট এলেই কোন বাংলা গানটা সবার আগে মনে পড়ে? বেশি ভাবার দরকার নেই। চটপট বলে ফেলুন, ভারত আমার ভারতবর্ষ। আচ্ছা, এটা কার গান? পাড়ার মোড়ে বা রকের আড্ডায় একটু সমীক্ষা করে দেখুন তো। বিচিত্র সব উত্তর পাবেন। কেউ বলবেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কেউ বলবেন অতুলপ্রসাদ বা রজনীকান্ত। তাও যদি না মেলে, তাহলে বাঙালির চিরন্তন রবি ঠাকুর তো আছেনই। এরপরেও যদি বলেন, উত্তর ঠিক হল না, তাহলে যাঁকে জিজ্ঞেস করছেন, তিনি আপনার সঙ্গে তর্কও জুড়ে দিতে পারেন।

গানের শেষ স্তবকগুলো একটু মনে করুন। ‘রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ/ নাহিকো ভাবনা, করি না চিন্তা/ হৃদয়ে নাহি কো ভয়ের রেশ।’ রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও এমন লাইন লিখতে পারেন!

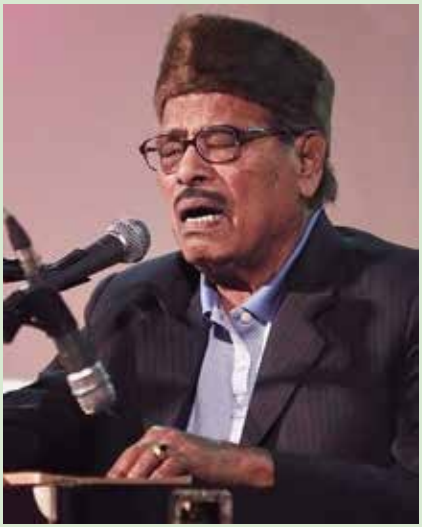

কিন্তু কে শোনে কার কথা! বাঙালি যখনই কোথাও আঁটকে যায়, ওই একটি ঠাকুরের নাম স্মরণ করে, তা হল রবি ঠাকুর।

অথচ, এই গানের যিনি গীতিকার, সেই শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বছর আগেও আমাদের মাঝে বেঁচে ছিলেন। যিনি সুরকার, সেই অজয় দাস, আর যিনি গেয়েছিলেন, সেই মান্না দে-ও ফেলে আসা দশকে আমাদের মধ্যে ছিলেন। এই গান অন্তত আড়াইশোটি স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত। স্বদেশ পর্যায়ের গান বলতে প্রথমের সারিতেই উঠে আসে এই গান। পনেরোই আগস্ট বা ছাব্বিশে জানুয়ারি মানেই

কোথাও না কোথাও বেজে উঠবে এই গান।

অথচ, এই গানের জন্মবৃত্তান্ত জানলে আপনাকে অবাক হতে হবে। গানটি কী ভেবে লেখা হয়েছিল? না, দেশাত্মবোধক তো দূরের কথা, কোনও সিরিয়াস মুহূর্তের কথা ভেবেও নয়। বরং কিছুটা কমেডির আদলে। ভাবতে পারেন, সিনেমায় চিন্ময় রায় এই গান গাইবেন, সেই ভেবে গানটি লেখা হয়েছিল!

চারমূর্তি ছবির কথা নিশ্চয় মনে পড়ছে। টেনিদা রূপী চিন্ময়ের কথাও নিশ্চয় মনে আছে! পরিচালক বললেন, ছবিতে টেনিদার লিপে এই গানটি থাকবে। যে টেনিদা প্রচণ্ড সাহসী হওয়ার ভান করে, কিন্তু আসলে প্রচণ্ড ভিতু। সেই টেনিদা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইবে। কী গান তৈরি করা যায়! পরিচালক বললেন 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এই জাতীয় কোনও গানের আদল থাকবে। শিবদাসবাবু লিখতে বসে গেলেন। লিখে ফেললেন ভারত আমার ভারতবর্ষ/ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। অজয় দাস সুরও দিয়ে ফেললেন। রেকর্ড করানো হল মান্না দে–কে দিয়ে।

ছবিটা মুক্তি পেল। কয়েক বছর যেতে না যেতেই গানটা অন্য এক মাত্রা পেয়ে গেল। মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এমনকি পনেরোই আগস্ট বাজতে লাগল। সেখান থেকে নানা স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীত হয়ে গেল। কখনও ভেবেছিলেন, এই গান এমন জনপ্রিয়তা পাবে? কথায় কথায় একদিন তাঁর নাকতলার বাড়িতে বসে একদিন জানতে চেয়েছিলাম শিবদাসবাবুর কাছে। প্রবীণ গীতিকার অকপটেই বলেছিলেন, 'শুধু আমি কেন, কেউই ভাবেনি। কী করে যে কী হয়ে গেল! অথচ, যেগুলো খুব সময় নিয়ে লিখি, সেগুলো মানুষের কাছে পৌঁছয় না।' এই গানকে ঘিরে অনেক অভিমান ছিল শিবদাসবাবুর। তাঁর পাড়ায় বা আশেপাশে বাজত এই গান। পতাকা তুলতেন কাউন্সিলর বা ক্লাবের সেক্রেটারি। অথচ, তাঁকে কেউ মঞ্চে ডাকত না। শেষেরদিকে বেরোতে পারতেন না। মাইকেই শব্দ কানে আসত। টিভি চালালেও কোনও না কোনও চ্যানেলে বেজে উঠত এই গান। কিন্তু কেউ গীতিকারের খোঁজ রাখেননি। একবুক অভিমান নিয়েই চলে গেছেন।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল অজয় দাসের ক্ষেত্রেও। তিনি যে এমন এক কিংবদন্তি হয়ে যাওয়া গানের সুরকার, সেটা কজনই বা জানতেন! অজয় দাসের নাম যাঁরা জানেন, তাঁরা পরের লাইনেই জুড়ে দেন, সুখেন দাসের ভাই। যেন নিজস্ব কোনও পরিচিতি নেই! তাঁকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম এই গানের কথা। বলেছিলেন, 'মান্নাদা নিজেও বুঝতে পারেননি। নিছক মজার ছলেই সুর করা হয়েছিল। কিন্তু এই গান যে এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, কে জানত! কাউকে বলি না, এই গান আমার সুর করা। কারণ, লোকে হয়ত বিশ্বাসও করবে না। ভাববে মিথ্যে বলছি।'

শিবদাসবাবু চলে গেছেন, অজয়বাবুও নেই। মান্না দেও নেই। হারিয়ে গেলেন চিন্ময়ও। বাঙালি শিকড় হারিয়ে এক অজানা পথে ছুটবে। বিনোদনের কত অজানা দিক হাজির হয়ে যাবে। দেশপ্রেমের কত নতুন আঙ্গিক বেরিয়ে আসবে। তবু পনেরোই আগস্ট এলেই বাঙালিকে শুনতেই হবে এই গান।

বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, নেতাজিকে চেনেন!

কাউকে মহান করতে গিয়ে অন্যদের ছোট করতে বাঙালির জুড়ি নেই। নেতাজিকে মহান করতে গিয়ে আমরা কত লোককে অহেতুক ছোট করি। আমাদের যত আগ্রহ নেতাজির মৃত্যু নিয়ে। কথা বললেই বোঝা যায়, নেতাজি সম্পর্কে এঁরা প্রায় কিছুই জানেন না। লিখেছেন সুমিত চক্রবর্তী।।

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই একটা পোস্ট চোখে পড়ে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ছাপা টাকায় গান্ধীজির পরিবর্তে নেতাজির ছবি ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের আরও একটি পোস্ট হল, চে গেভারার ছবিওয়ালা টি শার্ট না পরে, ভগত সিং-এর ছবিওয়ালা টি শার্ট পরুন।

এইসব পোস্টে চটপট লাইক ও কমেন্ট পড়তে থাকে। কিন্তু আমরা যারা নেতাজি বা ভগত সিং-এর ছবি ছাপানোর দাবিতে এত সরব তারা নেতাজি সম্বন্ধে কতটুকু জানি। কতটুকু জানি ভগত সিং সম্পর্কে? একবার আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা নেতাজিকে ধর্মীয় প্রার্থনা সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন। এই গান শুনে ক্রুদ্ধ নেতাজি বলেছিলেন, "কে এই সব লোক দেখানো চমক শিখিয়েছে?" তিনি আরও বলেছিলেন, "আমাদের আন্দোলনের ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ, এর চরিত্র রাজনৈতিক। এর সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবে না।"

নেতাজি সিঙ্গাপুরের একটি মন্দিরে প্রবেশ করতে চাননি। কারণ সেই মন্দিরে সব ধর্মের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমনকি নিচু জাতের হিন্দুদেরও ঢোকা নিষেধ ছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর, সব ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন।

নেতাজির জীবনের এই সব ঘটনার কথা আমরা প্রায় কেউই জানি না। আমরা জানি না, ভগত সিং নিজে নাস্তিক ছিলেন, তিনি বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। যারা ভগত সিংকে সত্যিই শ্রদ্ধা করেন, তারা কখনই চে গেভারার ছবির বিরোধিতা করবেন না। যারা নেতাজিকে শ্রদ্ধা করেন তারা কখনই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলবেন না।

টাকার নোটে নেতাজির ছবি ছাপানো বা টি-শার্টে ভগত সিং-এর ছবি ছাপানোর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করা। অবশ্য এই বাংলায় নেতাজি প্রেমের একটা সহজ সূত্র আছে। গান্ধীজিকে গালাগাল দাও, তাহলেই তুমি নেতাজির অনুরাগী। এরা না পড়েছে গান্ধী, না পড়েছে নেতাজি। জিজ্ঞেস করুন, দু লাইনের বেশি বলতে পারবেন না। হায় রে, জাতির জনক নামটা কার দেওয়া, সেটাও এরা জানে না।

বিনোদন

রঞ্জন ভট্টাচার্য

দর্শক সহযাত্রী হয়ে উঠল কই!

সেই শুরু করেছিলেন উত্তম কুমার। অবশ্য শুধু উত্তম কুমার কেন বলি, তার সঙ্গে যে সত্যজিৎ রায়ের নামও জড়িয়ে আছে। ফেলুদার স্রষ্টার হাত ধরেই পর্দায় ব্যোমকেশের আগমন। মাঝে লম্বা একটা বিরতি। তারপর নয়ের দশকে দূরদর্শনে হাজির বাসু চ্যাটার্জির ব্যোমকেশ বক্সি। সিরিয়ালটা যদিও হিন্দিতে, তবু রজিত কাপুরকে ব্যোমকেশ মানতে বাঙালির তেমন দ্বিধা ছিল না।

তার পরেও লম্বা বিরতি। কিন্তু তার পর থেকেই যেন ব্যোমকেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি এসে গেল। কখনও অঞ্জন দত্ত, কখনও অরিন্দম শীল, যে পারলেন, একটা করে ব্যোমকেশ বানিয়ে দিলেন। ব্যোমকেশের ভূমিকায় কোথাও আবীর, তো কোথাও যিশু। একে একে কেউই বাদ গেলেন না। অবশেষে বৃত্ত সম্পূর্ণ। কারণ, এবার ব্যোমকেশের ভূমিকায় দেব।

আসলে, ফেলুদা-ব্যোমকেশ নামগুলোর সঙ্গে বাঙালির এমন কিছু নস্টালজিয়া রয়ে গেছে, পান থেকে চুন খসলেই নানা সমস্যা। বিশেষ করে দেব যখন ব্যোমকেশের ভূমিকায়, তখন 'গেল গেল' রব তোলার লোকেরও অভাব নেই। আবার যাঁরা দেবের অনুরাগী, তাঁরা অন্য দেবকে দেখতে অভ্যস্থ। তাঁদের আবার এই বদলে যাওয়া দেবকে কতখানি ভাল লাগে, সেটাও বড় প্রশ্ন।

যাই হোক, বিরসা দাশগুপ্তর পরিচালনায় দেব মোটামুটি উতরে গেছেন। দুর্গরহস্য যত না উপন্যাস হিসেবে বিখ্যাত, সানডে সাসপেন্সের জন্যও কম বিখ্যাত নয়। ফলে, গল্প মোটামুটি অনেকেরই জানা। আসলে, ব্যোমকেশ বলতে যে টিপিক্যাল বাঙালিয়ানা মনে পড়ে, এখানে তার ধারপাশ দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করেননি পরিচালক। দেবও কাউকে নকল করার কোনও চেষ্টা করেননি। করেছেন নিজের মতো করে। তাই অনেক জায়গায় গল্পের সঙ্গে মেলেনি। মেলার কথাও নয়।

দেবকে এখানে লার্জার দ্যান লাইফ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। তাঁর আগমনের মধ্যেও যথেষ্ট সাসপেন্স আছে। ধুতি নয়, এখানে প্যান্ট শার্টই পরানো হয়েছে। তাছাড়া, ব্যোমকেশ মানেই অনেকটা অংশ ঘরের ভেতর। এখানে ঘরের বাঁধন ছেড়ে একটু বাইরের হাতছানি। নাম দুর্গরহস্য। সেই রহস্যের কিনারা করতে যেমন দুর্গের নানা প্রান্তে যেতে হয়েছে, তেমনই বাইরে খোলা জায়গাতেও পৌঁছে গেছে ক্যামেরা।

ইতিহাসের কিছু অংশ আছে। পলাশির যুদ্ধ যেমন আছে, তেমনই আছে তার একশো বছর পরের সিপাহি বিদ্রোহের কথাও। এমন দৃশ্যপট আনাটা বেশ খরচ সাপেক্ষ। বোঝাই যাচ্ছে, প্রযোজক কার্পণ্য করেননি। বাজেট সীমিত রাখার চেষ্টা করেননি। তাছাড়া, যেখানে ব্যোমকেশ হিসেবে দেবকে নেওয়া, সেখানে কার্পণ্য থাকার কথাও নয়।

তবে ব্যোমকেশ মানে তো শুধু ব্যোমকেশ নয়। সঙ্গে থাকা অজিতের ভূমিকায় অম্বরীশ ভট্টাচার্য। কমেডির জন্যই অম্বরীশের পরিচিতি। কিন্তু এখানে কিছুটা গণ্ডগোল করে ফেলেছেন চিত্রনাট্যকার। অজিতের ভূমিকায় অম্বরীশ, এটা সবসময়ই মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। ফলে, অজিতকে দিয়ে অহেতুক কমেডি করানো হয়েছে। ফলে, অজিত যতটা না অজিত, তার থেকে যেন বেশি জটায়ু। শরদিন্দুর অজিত নিজে একজন লেখক। যথেষ্ট বিচক্ষণ। কিন্তু তাঁকে দিয়ে কমিক রিলিফ আনাতে গিয়ে বুদ্ধিতে বা ব্যক্তিত্বে কোথায় যেন টান পড়ে গেল। আর সত্যবতী। আসল গল্পে সত্যবতীর

কথা ছিল না। এখানে পরিচালক আনতেই পারেন। কিন্তু দেব নিলে যেন রুক্মিনি ফ্রি। মানে, রুক্মিনিতে নিতে হবে, তাই সত্যবতীকে আনা। অন্য জায়গায় সত্যবতীকে যেমন বুদ্ধিমতি মনে হয়, এক্ষেত্রে মোটেই তেমনটা হয়নি। বরং, অনেক বেশি ন্যাকামি প্রকাশ পেয়েছে। সবার জন্য সব চরিত্র নয়, এটা বুঝিয়ে দিতে রুক্মিনি বেশ 'সফল'।

একটা গল্প দাঁড়িয়ে থাকে মূলত চিত্রনাট্যের ওপর। কিন্তু এখানে সেই চিত্রনাট্য বড়জোর দশে পাঁচ পেতে পারে। আর দশটা ব্যোমকেশের সঙ্গে দেবের ব্যোমকেশ হওয়ার একটা তফাত আছে। থাকবেও। পর্দায় দেবের উপস্থিতি একটু বেশি থাকবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু একটা গল্প তো শুধু গোয়েন্দা কেন্দ্রিক নয়। গল্প এগোয় নিজের নিয়মে। অন্য চরিত্রেরও অনেক কিছু বলার থাকে। সম্পর্কের জটিল রসায়ন থাকে। সেগুলো কোথাও একটা উপেক্ষিত থেকে গেছে।

শুরু থেকেই দর্শকের কাছে অহেতুক কিছু গোপনীয়তার পর্দা ঝোলানো হয়েছে। গোয়েন্দা সিনেমার সাফল্যের চাবিকাঠি হল, দর্শক নিজেও নিজেকে ছোটখাটো গোয়েন্দা ভাববেন। তিনিও তাঁর মতো করে সমাধান করতে করতে এগোবেন। কোথাও সেই ধারনা মিলবে, কোথাও হয়ত মিলবে না। অর্থাৎ, মোদ্দা কথা, দর্শককে আরও একাত্ম করা। কিন্তু এখানে চিত্রনাট্যের জটিলতায় দর্শক শুরু থেকেই তেমন একাত্ম হতে পারছেন না। মনে হবে, ধুর, কিছুই বুঝতে পারছি না। শেষবেলার জন্য অপেক্ষা করার ছাড়া তার আর কিছু করার থাকছে না। সে কখনই গল্পের সহযাত্রী হতে পারছে না। এই জায়গায় মস্তবড় একটা ফাঁক থেকে গেল।

পুজো সংখ্যায় এত তাড়াহুড়ো কেন?

অমিত ভট্টাচার্য

এবার পুজো অনেক দেরিতে। একেবারে অক্টোবরের শেষ লগ্নে। অর্থাৎ, এখনও প্রায় আড়াই মাস বাকি। এর মধ্যেই হাজির হয়ে গেল তিন-তিন খানা পুজো সংখ্যা। শুরু হয়েছিল আনন্দমেলা দিয়ে। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই এসে গেল আনন্দবাজার। তার ঘাড়ে জোরালো নিঃশ্বাস ফেলতে এসে গেল আনন্দলোক। কী জানি, এবার হয়ত বাংলা নববর্ষথেকেইপুজোসংখ্যাবেরোতেশুরুকরবে।

অনেকদিন আগে সুমনের একটা গান শুনেছিলাম, 'সাহিত্য মরে পুজো সংখ্যার চাপে।' তখন ঠিক বুঝিনি, এখন মনে হয়, কথাটা অনেকটাই সত্যি। এই পুজো সংখ্যার লেখাগুলোই পরে বইমেলায় বই হয়ে বেরোয়। একেকজন লেখককে নানা জায়গায় লিখতে হয়। পাইকারি হারে জোগান দিতে গিয়ে লেখার মান ঠিক থাকছে না। এ যেন অনেকটা মেগা সিরিয়া-লের মতো। যেভাবে হোক, টেনে বাড়িয়ে যেতে হবে। ষাট পাতার উপন্যাস পড়ার পর মনে হয়, এত লেখার কী দরকার ছিল? এটা তো ছোট গল্পের প্লট। টেনেহিঁচড়ে গায়ের জোরে উপন্যাসের চেহারা দেওয়া হয়েছে। আগে একটা উপন্যাসের পেছনে যে পরিশ্রম, যে মেহনত লুকিয়ে থাকত, এখন আর তা থাকছে না। কারও কারও লেখায় হয়ত থাকছে, কিন্তু সেগুলি মানুষের কাছে

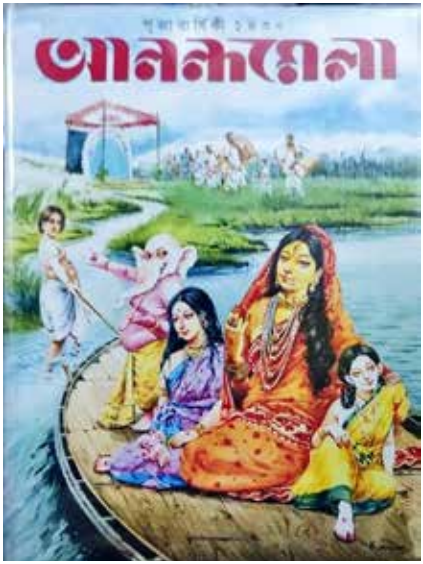

পৌঁছচ্ছে না। কারণ, মূলস্রোত পত্রিকায় তাঁদের জায়গা নেই। তাঁদের লেখা এমন সব কাগজে বেরোয়, যেগুলি স্টলে পাওয়া যায় না। সেগুলি পড়তে গেলে আপনাকে কলেজ স্ট্রিটের পাতিরাম বা ধ্যানবিন্দুতে যেতে হবে।

এ তো গেল লেখকদের কথা। এবার আসি পাঠকদের কথায়। দৈনন্দিন ব্যস্ততা সবার জীবনেই আছে। তার ওপর এসে যোগ হয়েছে স্মার্টফোন নামক নতুন উপদ্রব। মানুষের ধৈর্য একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। ফলে, আগে যেমন একটা পুজো সংখ্যা পাঁচ-ছদিনে শেষ হয়ে যেত, এখন পাঠকের কাছে সেই ফুরসত নেই। ফলে, রয়ে-সয়েই পড়তে হয়।

এখানেই প্রশ্ন, পাঠককে তো পড়ার সময় দিতে হবে। যেমন আমার কথাই বলি। কয়েকদিন আগে বের হল বেরোলো আনন্দমেলা। ছোট থেকেই পড়া অভ্যেস। সেই অভ্যেসবশেই আজও কিনি। সবটা না হোক, অন্তত অর্ধেক তো পড়া হয়। কিন্তু এবার সেই ফুরসতটাই পেলাম না। সাতদিনের মাথায় বেরিয়ে গেল আনন্দবাজারের পুজো সংখ্যা। স্টলে এসেছে। না নিয়েও থাকা যাচ্ছে না। আবার এটাও বেশ বুঝতে পারছি, ওটা নেওয়া মানেই আনন্দমেলার প্রতি আরও অবিচার হবে। কারণ, আনন্দবাজার পড়তে শুরু করলে আনন্দমেলার লেখাগুলোতে হাতই দেওয়া হবে না। 'পরে পড়ে নেব' ভেবে হয়ত সরিয়ে রাখব, তার ফাঁকেই অন্যান্য পুজো সংখ্যা হাজির হয়ে যাবে। সেই 'পরে পড়া' আর হয়ে উঠবে না। এরই মাঝে হাজির আনন্দলোক। মূলত সিনেমার পত্রিকা। রেগুলার সংখ্যাগুলো সবসময় পড়া হয় না। কিন্তু পুজো সংখ্যায় তো গোটা পাঁচেক ভাল মানের উপন্যাস থাকে। না পড়লেও নয়। অথচ, সময় কই। আগের দুটো যে এখনও নতুনই রয়ে গেছে।

কে কখন পুজো সংখ্যা বের করবে, সেটা একান্তই তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু একই প্রতিষ্ঠান থেকে আনন্দমেলা আর আনন্দবাজার (পরে আসবে পত্রিকা, দেশ) বেরোয়, তাই একটা সমন্বয় রাখা দরকার। যেমন আনন্দ-বাজার বেরোনোর সাথে সাথেই যদি 'দেশ' বেরিয়ে যায়, তাহলে আনন্দবাজারের প্রতিও অবিচার হবে। তাই অন্তত পনের দিনের গ্যাপ রাখা হোক। আশা করি, আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ বিষয়টা ভেবে দেখবেন।

বুক প্রিভিউ

পরিচালকদের কাজটা আশি ভাগ এগিয়ে রাখল ‘নিয়তি’

স্বরূপ গোস্বামী

বুক রিভিউ সাধারণত বই পড়ার পরেই লেখা হয়। কিন্তু কিছু কিছু বিষয় থাকে, কিছু কিছু বই থাকে, যা পড়ার আগেই তার স্পন্দন অনুভব করা যায়। তেমনই একটি বই ‘নিয়তি।’ তাই বুক রিভিউ না বলে এই লেখাকে বুক প্রিভিউ-ও বলা যায়।

নামটা শুনে মনে হতেই পারে, কোনও ধর্মীয় বা ভৌতিক বিষয় নিয়ে বই। একেবারেই তা নয়। একেবারে সবুজ ঘাসের গন্ধ মাখা, খেলার মাঠের বই। ইডেনের একটি অভিশপ্ত দিন ও তার নানা উপাখ্যান। সময়ের দলিল হয়ে ওঠা আস্ত এক উপন্যাস। মৃত্যুর কথা। আসলে, মৃত্যুকে ছাপিয়ে জীবনের কথা।

পরপর দু’বছর বইমেলায় দু’খানা বই। একটির বিষয় মোহনবাগান। অন্যটির ইস্টবেঙ্গল। দুটিতেই দারুণ সাড়া ফেলেছেন অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। দুই দশক ধরে মূলস্রোত সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। তারও আগে, বাবার হাত ধরে যুবভারতীতে ম্যাচ দেখতে আসা। কৈশোর থকেই মোহনবাগান শব্দটা যেন মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া। ময়দানের পরিচিত নামগুলো শুরু থেকেই মনের মধ্যে উঁকি দেওয়া।

সেই আবেগটাই টেনে এনেছিল ক্রীড়া সাংবাদিকতায়। প্রেসবক্সের ঠান্ডা ঘর ছেড়ে মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যেতেন কোলাহল মুখর গ্যালারিতে। কখনও ঘুগনি বিক্রেতার সঙ্গে, কখনও লজেন্স মাসির সঙ্গে জুড়ে দিতেন গল্প। কোন ছেলে বাবার চিতায় আগুন দিয়ে মাঠে চলে এসেছে, কে ডার্বি দেখবে বলে বিয়ের দিন পিছিয়ে দিল, এই চরিত্রগুলোকে নিজের মতো করে চিনতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন। তাই তাঁর দু’খানা বই নিছক তথ্যনির্ভর প্রবন্ধের বই নয়। ব্যাখ্যা নির্ভর ইতিহাসও নয়। খেলোয়াড়দের গল্প, সমর্থকদের গল্প হয়ে উঠেছে। যে যাঁর মতো করে একাত্ম হয়েছেন।

এবার একটু সাহস করে আরও একটা বড় কাজে হাত দিয়েছেন। ১৯৮০-র সেই ষোলই

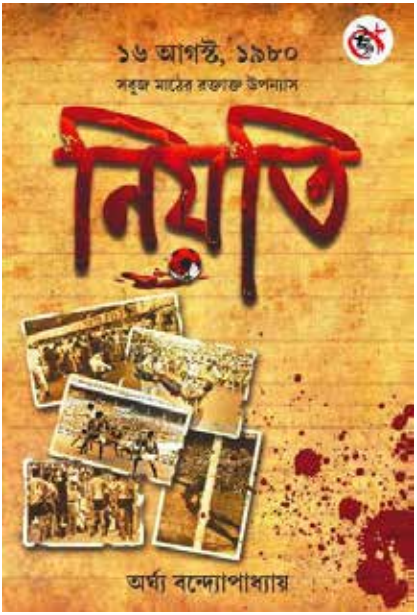

আগস্টকে নিয়ে লিখে ফেললেন আস্ত একটা উপন্যাস। এই উপন্যাস লেখার যোগ্য লোক আগে হয়ত অনেকেই ছিলেন। বিশেষ করে যাঁরা সেই সময় চুটিয়ে সাংবাদিকতা করেছেন। তাঁদের পক্ষে কাজটা হয়ত কিছুটা সহজও হত। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, তাঁরা সেই তাগিদ অনুভব করেননি। সেই জটিল কাজে হাত দিয়েছেন অর্ঘ্য।

সেই ঘটনা যখন ঘটে, তখন লেখকের বয়স কত? এক বা দুই বছর। ফলে, ঘটনার তাৎক্ষণিক কোনও অভিঘাত থাকার কথা নয়। দেরিতে জন্ম হওয়াটা তো লেখকের দোষ হতে পারে না। বরং, তার দু'দশক পরে সাংবাদিকতায় এসেও যে সেই ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়, সেটা অর্ঘ্য বুঝিয়ে দিলেন। আসলে, এটা হঠাৎ করে লিখে ফেলা কোনও বই নয়। সলতে পাকানোর পর্বটা অন্তত দু'দশকের। কিশোর বেলা থেকেই এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনেছেন। পরে সাংবাদিকতায় এসে বছরের পর বছর স্বজন হারানো পরিবারগুলোর সঙ্গে মিশেছেন। তাঁদের স্বজনহারানোর যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। যাঁরা সেদিন খেলেছিলেন, কালো পোশাক পরে যাঁরা রেফারির ভূমিকায় ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে দু'দশক ধরে মিশেছেন। নিছক সেলফি তুলে দায় সারেননি। 'এই সময়' এ বাস করেও, সেই সময়ের নানা গল্প খুঁটিয়ে বের করেছেন। মরমী মনে তা অনুভব করেছেন।

রোদে পুড়ে, জলে ভিজে মানুষ কেন খেলা দেখতে আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেন লাইন দিয়ে টিকিট কাটে। ঘোড়া-পুলিশের তেড়ে আসা দেখেও সে কীভাবে নির্ভিক হয়ে একটা টিকিটের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। এইসব অনুভূতিগুলো সংবেদনশীল সাংবাদিক অর্ঘ্যর অচেনা নয়। বছরের পর বছর, এই অনুভূতি গুলোই উঠে আসে তাঁর নানা প্রতিবেদনে। সেলফি আর ফেবু ম্যানিয়ায় আক্রান্ত এই প্রজন্মের খুব কম সাংবাদিককেই এই অনুভূতি-গুলো ছুঁয়ে যায়। অর্ঘ্যর একটা সম্পদ যদি হয় ময়দানের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ, তাহলে অন্য সম্পদ হল নির্মেদ ও ঝরঝরে ভাষা। সেইসঙ্গে গুছিয়ে গল্প বলার মুন্সিয়ানা। একসঙ্গে এতরকম সম্পদ নিয়ে ময়দানে আর কেউ বিরাজ করছেন! সত্যিই জানা নেই।

হ্যাঁ, এমন একটা বিষয় নিয়ে উপন্যাসের মোড়কে

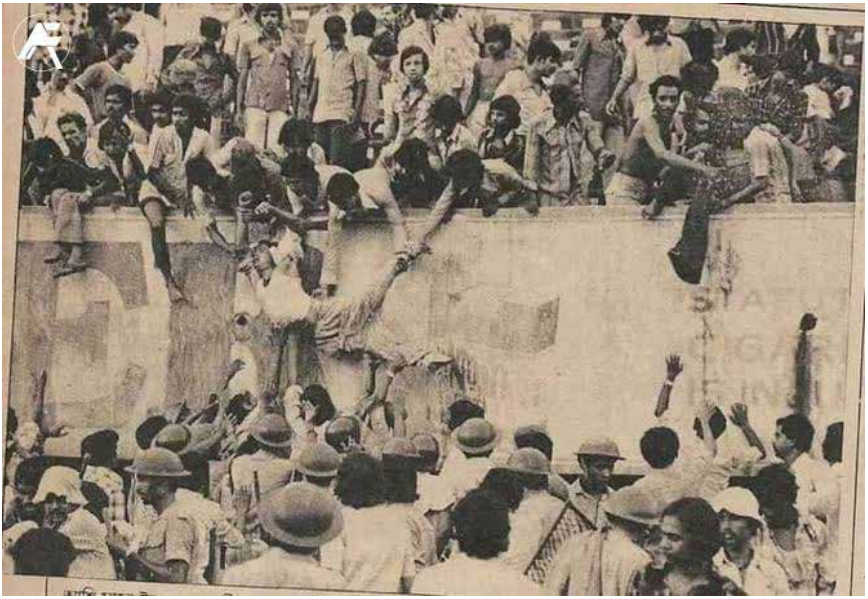

একটা প্রামাণ্য দলিলের দরকার ছিল। এবং এই প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে অর্ঘ্যই সেই কাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। আসল কথা, পড়া, পড়া এবং পড়া। যে অভ্যেসটা কমতে কমতে প্রায় লুপ্তই হতে বসেছে। অর্ঘ্যর মধ্যে পড়াও আছে, শোনাও আছে। তাই সুপর্ণকান্তির তৈরি গানও অনায়াসে প্রতিবেদনের বিষয় হিসেবে উঠে আসে। ষোল আগস্ট প্রতি বছরই আসে, যায়। কই, আর কারও মধ্যে তো এমন ভাবনা দেখি না। উপন্যাসে এই গানের কথা থাকবে! থাকারই কথা। সেই গানটাও তো সেই সময়েরই কথা বলে। নানা আঙ্গিক থেকে ঘটনাকে দেখা। নানা আঙ্গিক থেকে সেই ফুটবল অনুরাগকে ছুয়ে দেখা। আসলে, টাইম মেশিনে চড়ে সেই সময়টাকেও ছুয়ে দেখা। সঙ্গে কোথাও কোথাও সোনায় খাদ মেশানোর মতোই কল্পনার রঙ মেশানো। আসলে, ৪৩ বছর পর কোনও ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গেলে অনেক মিসিং লিঙ্ক থেকে যায়। সেগুলোকে জুড়তে কল্পনার এই মিশেলটাও জরুরি। নইলে তা আলুবিহীন বিরিয়ানির মতো বেমানান হয়ে যাবে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এই বইয়ে কোনও নায়ক থাবে না, কোনও ভিলেনও থাকবে না। থাকবে টুকরো টুকরো কিছু ছবি। আর সব ছবির কোলাজে ‘নিয়তি’ হয়ে উঠবে একটা বিরাট ক্যানভাস। ‘এগারো’ যদি সেলুলয়েডে ধরা দেয়, তাহলে ষোল আগস্ট বিষয় হবে না কেন? নতুন প্রজন্মের পরিচালকরা এখন থেকেই চোখ রাখুন। তাঁদের হয়ে গবেষণার কাজটা অর্ঘ্যই করে দিয়েছেন। তাঁরা শুধু দ্রুত ছবির সত্ব কিনে ফেলুন। হ্যাঁ, বই বাজারে আসার আগেই।

বেঙ্গল টাইমস শারদ সংকলন

প্রতিবারের মতো এবারও থাকছে বেঙ্গল টাইমসের আকর্ষণীয় পুজো সংখ্যা। চাইলে হয়ত অনেক আগেই বের করা যেত। কিন্তু জুলাই বা আগস্ট থেকে পুজো সংখ্যা বেরিয়ে গেলে তার রেশ অনেক আগেই ফুরিয়ে যায়। তাই বেঙ্গল টাইমসের পুজো সংখ্যা আসে পুজোর গন্ধ গায়ে মেখেই।

এবার পুজো অনেকটাই দেরিতে। পুজো সংখ্যাও প্রকাশিত হবে একটু দেরিতে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। যেন পুজোর আগে পড়া শেষ হয়ে যায়। প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কিছু লেখা থাকছে আমন্ত্রিত। পাশাপাশি, বেঙ্গল টাইমসের পাঠকদের জন্যও দরজা খোলা। তাঁরাও লিখতে পারেন।

আপনারা পাঠাতে পারেন:

১) গল্প

২) অনু গল্প

৩) ছোট কবিতা/ছড়া

৪) ভ্রমণ

৫) ফিচার

৬) শ্রদ্ধার্ঘ/স্মৃতিচারণ

৭) খেলা সংক্রান্ত লেখা

- লেখা পাঠান ইউনিকোডে।
- লেখা যেন ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত না হয়।
- লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর।
- চেষ্টা করুন ৫০০ থেকে ১০০০ শব্দের মধ্যে পাঠাতে।
- লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবিও পাঠাতে পারেন।

সম্পাদকমণ্ডলীর বিচারে মনোনীত হলে, তবেই প্রকাশিত হবে।
লেখা পাঠিয়ে তদ্বির করবেন না।
মনোনীত হলে আগাম জানিয়ে দেওয়া হবে।
লেখার সঙ্গে ফোন নম্বর ও ই মেল আইডি অবশ্যই পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
bengaltimes.in@gmail.com

খেলা

টিকিটের লাইন দেখে গর্বিত নয়, লজ্জিত হতে শিখুন

ধীমান সাহা

ডার্বি মানেই এঁকে বেঁকে যাওয়া একটা লম্বা লাইন। কখনও সেই লাইন লাল হলুদ তাঁবুর সামনে। কখনও আবার সবুজ মেরুন তাঁবুর সামনে। সাতের দশক, আটের দশকে এটাই ছিল চেনা ছবি।

ডুরান্ডের ডার্বিতে আবার সেই দৃশ্য। অনেকেই যেন আবেগে আত্মহারা। আহা, সেই পুরনো উন্মাদনা ফিরে আসছে। তাঁবুর সামনে ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে আছেন সমর্থকরা। এই দৃশ্য দেখার পর সেই সমর্থকদের কুর্নিশ করতে ইচ্ছে করে। সত্যিই তো, এরাই অক্সিজেন। এঁরা আছেন বলেই কলকাতায় ফুটবল এখনও সজীব। কিন্তু মুদ্রার উল্টোপিঠের ছবিটাই বেশি করে ভাবাচ্ছে। একটা টিকিটের জন্য এত লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে কেন? ভোর চারটে থেকে তাঁবুর সামনে ভিড় করতেই বা হবে

কেন? এত ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হবে কেন? সমর্থকদের যদি কুর্নিশ জানাতে হয়, ঠিক ততটাই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে আয়োজকদের।

এত বছর ধরে শুনে আসছি, ডুরান্ড কাপ মানে সেটা সেনাবাহিনীর টুর্নামেন্ট। সেটা হয় দিল্লিতে। গত কয়েক বছরে যেন ছবিটা অন্যরকম। এখন কলকাতায় ডুরান্ড হচ্ছে। মোদ্দা কথা হল, সেনাবাহিনীর এখন আর সেই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার ক্ষমতা নেই। আর্থিক ক্ষমতা হয়ত আছে। কিন্তু মাঠে লোক জড়ো হবে কী করে? সেনা যেন রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর রাজ্য সরকারও এটাকে মমতা ব্যানার্জির সাফল্য হিসেবে দেখাতে মরিয়া। হোর্ডিং বা প্রচারের হাবভাব দেখে মনে হয়, এই ডুরান্ড কাপও হয়ত মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণাতেই শুরু হয়েছে। একদিন প্রেস কনফারেন্স হয়, মমতা ব্যানার্জিকে উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আরেকদিন প্রেস কনফারেন্স হয়, মমতা ব্যানার্জি উদ্বোধন করতে রাজি হয়েছেন। ছেলেমানুষির চূড়ান্ত।

আবার সেই ডার্বির টিকিটের প্রসঙ্গে আসি। দায়িত্ব কার? কৃতিত্ব নিতে সবাই তৈরি। কিন্তু দায় নিতে কেউই রাজি নন। সেনাবিহিনী দেখিয়ে দেয় রাজ্যকে। রাজ্য দেখিয়ে দেয় সেনাকে। ক্লাব দেখিয়ে দেয় রাজ্য ও সেনাকে। সবাই যদি দায় এড়াতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহলে যা হওয়ার, তাই হয়। সুষ্ঠু সমাধানের বদলে সমস্যা বেড়েই চলে। দুই ক্লাবের সদস্যদের জন্য নাকি দেওয়া হয়েছে পাঁচ হাজার করে টিকিট। আর সমর্থকদের জন্য তেরো হাজার করে। অর্থাৎ, দুই ক্লাব মিলিয়ে ছত্রিশ হাজার টিকিটের একটা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। বাকি তিরিশ হাজার টিকিট গেল কোথায়? কারা সেগুলো বিলি করলেন? কেচো খুঁড়তে গেলে নির্ঘাত কেউটে বেরিয়ে আসবে। দুই ক্লাবকর্তারা প্রশ্ন তুলবেন না। তোলার কথাও নয়। দাঁত কেলিয়ে তৃণমূলের মঞ্চে গেলে, এসব প্রশ্ন তোলার মুরোদ থাকে না।

যে কটা টিকিট পাওয়া গেল, সেগুলোও কি একটু সুষ্ঠুভাবে বিলি করা যেত না? সহজ একটা অঙ্ক। কাউন্টারের সামনে ধরা যাক দু হাজার লোকের লাইন। সেই লাইন নিশ্চিত-ভাবেই এক কিলোমিটার ছাপিয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি চারটে কাউন্টার থাকত, তাহলে কী হত? সহজ হিসেব, ভিড়টা চার ভাগে ভাগ হয়ে যেত। লাইনগুলো এত লম্বা হত না। টিকিট পেতেও এত ভোগান্তি হত না। ক্লাব কর্তারা হাজার হাজার সমর্থকদের ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত লাইনে দাঁড় করাতে পারেন। কিন্তু কাউন্টারে চারজন কর্মী জোগাড় করতে পারেন না। এটা কার অপদার্থতা?

অথচ, এমন অপদার্থতার পরেও এই কর্তারা টিভির সামনে দাঁত কেলিয়ে বাইট দেন। সমর্থকদের উন্মাদনা দেখে আপ্লুত হওয়ার নাটক করেন। পরেরদিন কাগজে নিজেদের বিবৃতি দেখে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলেন।

সহজ কথা, পেশাদারি দক্ষতা থাকলে এই টিকিট বন্টন মসৃণভাবে হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই কর্তাদের সেটা নেই। তাই সমর্থকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই লম্বা লাইন আবেগের বার্তা নয়। কর্তারা কতখানি অপদার্থ, তার বার্তা। এই লম্বা লাইন দেখে, গর্বিত নয়, কর্তারা একটু লজ্জিত হোন।

গোলপাহাড়ের টিলায় বসে...

শ্যামল মুখার্জি

পাহাড় বলবেন নাকি ছোট ছোট টিলা! দলমা রেঞ্জের দিকে গেলে এমন কত অসংখ্য টিলা দেখা যায়। কোনওটা রুক্ষ, কোনওটা আগাছায় ঢাকা। ট্রেনে যেতে যেতে বা বাসে যেতে যেতে দূর থেকেই সেইসব টিলা দেখেছি। কাছে যাওয়া হয়নি। কী জানি, যদি সাপখোপ থাকে! যদি বন্য জন্তু থাকে। তাছাড়া, ওই টিলায় কোন বাস দাঁড়াতে যাবে! কেনই বা দাঁড়াতে যাবে!

এই টিলা একেবারেই অন্যরকম। পাহাড়ের ঢালে চা-বাগান নতুন কিছু নয়। পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে উঠতে উঠতে এমন কত বাগান উঁকি দেবে। কিন্তু এই গোলপাহাড়ের সৌন্দর্য অন্যরকম। একের পর এক ছোট্ট গোল গোল পাহাড়। সবগুলিই প্রায় একই উচ্চতার। সব ছোট পাহাড়গুলোই চা-গাছে ঘেরা। ধূসর বা রুক্ষ বাগান নয়, চরাচরজুড়ে সবুজের অভিযান। দু'পাশে দুটো গোল পাহাড়, মাঝের রাস্তা দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, দৃশ্যটা ভাবলেই অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ এসে যায়।

এই পথে বেশ কয়েকবার পেরিয়ে গেছি।

মিরিক থেকে দার্জিলিং ওঠার রুট। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার একটা রাস্তা উঠে গেছে কার্শিয়াং হয়ে। অঞ্জন দত্তর গানের ভাষায়, টুং, সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে। সবাই এই রাস্তা দিয়েই ওঠেন। কারণ, সময় কিছুটা কম লাগে। কিন্তু হাতে যদি একটু বাড়তি সময় থাকে, তাহলে একবার মিরিক হয়ে উঠতে পারেন। যাওয়ার পথেই নেপাল সীমান্ত, টুক করে একবার ঝটিকা সফরে বিদেশ ভ্রমণ করে নিতে পারেন। নিদেন পক্ষে ওপারে গিয়ে এক কাপ চাও খেয়ে আসতে পারেন। আবার ভারতের ভূখণ্ডে ফিরে এসে সুখিয়া পোখরি, লেপচা জগৎ, ঘুম হয়ে দার্জিলিং পৌঁছে যেতে পারেন।

দূরত্ব একটু বেশি ঠিকই, তবে চা-বাগান আর পাইন বনে ঘেরা রাস্তা একটা বাড়তি রোমাঞ্চ এনে দেবে। আমাদের এই গোলপাহাড় অবশ্য এতটা দূরে নয়। তার অনেক আগেই। ধরে নিন মিরিক থেকে আরও আধ ঘণ্টার মতো। এখানে

পাহাড়টা একেবারেই অন্য রকম। ছোট ছোট টিলা। সাহেবরা চা-বাগান বানাতে গিয়ে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটাও মাথায় রেখেছিলেন। এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, আর কোথাও যাওয়ার দরকার পড়বে না।

এর সন্ধান দিয়েছিলেন তাবাকোশির বিজয় সুব্বা। তাঁর হোম স্টেতেই ছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোথায়? সেই সিদ্ধান্তের ভার তাঁর ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনিই বলেছিলেন, নেপাল সীমান্তের কাছে একটা গ্রাম আছে, একেবারে চা-বাগানের মাঝেই। দেখুন, আপনাদের ভাল লাগবে। তিনিই সন্ধান দিয়েছিলেন মঞ্জোশীলা হোম স্টের। আসলে, তাবাকোশি এতটাই ভাল লেগেছিল যে সংশয় হচ্ছিল, পরের জায়গাটা যদি ভাল না হয়। কিন্তু গন্তব্য যত এগিয়ে আসছে, মুগ্ধতা যেন তত বাড়ছে। পাইন গাছের জঙ্গল থেকে মেঘ ভেসে আসছে। সঙ্গে দিগন্ত বিস্তৃত চা-বাগান তো আছেই। যেখানে দাঁড়াবেন, সেখানেই ভিউ পয়েন্ট।

দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম মঞ্জোশীলায়। একমুখ হাঁসি নিয়ে হাজির মনোজ তামাং। ভারী চমৎকার মানুষ। এমন সরল, আন্তরিক ও অতিথি পরায়ণ মানুষ চাইলেও ভুলতে পারবেন না। পুরো বাড়িটাই পাইন কাঠে মোড়া। সামনে ছোট্ট একফালি উঠোন। সেখানে

বসলেই হাতের সামনে ধরা দেবে সেই গোলপাহাড়। ঘরের বিছানায় বসে মনে হবে, জানালার ওপারেই যেন চা বাগান। এত কাছ থেকে এমন সুন্দর বাগান দেখার রোমাঞ্চই আলাদা। মনের মধ্যে জমে থাকা নাগরিক ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি একলহমায় যেন হারিয়ে যায়। মনে হবে, চুলোয় যাক কাজবাজ, চুলোয় যাক ব্যস্ততা। সব ছেড়ে এখানেই থেকে যাই। সঙ্গে যদি এমন আতি-থেয়তা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। একটা ছোট্ট সতর্কীকরণ: দিনের বেলা বেশ রোমাঞ্চকর। তবে সূর্য ডুবলে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তাই পর্যাপ্ত শীতপোশাক নিয়ে যাওয়াই ভাল।

আলাদা করে কোনও গাড়ি নেওয়ার দরকার নেই। আলতো পায়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে যান গোলপাহাড় ভিউ পয়েন্টের দিকে। হাঁটা পথে মিনিট দশ। দু-পাশে খাড়া চা-বাগান। আপনি আপন মনে হেঁটে যান। যতদূর মন চায়। কখনও ইচ্ছে হলে কোনও এক টিলায় উঠে পড়ুন। ছবি তোলার শখ থাকলে এটুকু হলফ করে বলা যায়, আপনার সেরা মুহূর্তগুলো হয়ত এই গোলপাহাড়ের জন্যই তোলা আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য ঘটা করে টাইগার হিল যেতে হবে না। হোম স্টের সামনের ওই ছোট্ট পাহাড়ে উঠে পড়ুন। পাহাড় শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। উঠতে লাগবে বড়জোর মিনিট দশেক। বয়স্করাও অনায়াসে উঠে পড়তে পারেন। একটু শুধু সাত সকালে উঠে পড়ুন। সকালের প্রথম সূর্যরশ্মি কীভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর ঠিকরে পড়ছে, কীভাবে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা ছন্দে ছন্দে রঙ বদলাচ্ছে, দেখতে থাকুন। কখনও হয়ে উঠছে বাদামি, কখনও সোনালি, আবার কখনও ঝকঝকে সাদা।

ছবি কত কথা বলে যায়! গুগলবাবু তো আছে। একবার গোলপাহাড় লিখে দেখুন। তাহলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চাইলে ইউটিউবের শরণ নিতেই পারেন। একবার শুধু একঝলক দেখে নিন। যেমন দেখছেন, তার থেকে ঢের ভাল। তথাকথিত দার্জিলিং, গ্যাংটক তো অনেক দেখেছেন। এবারের ঠিকানা হোক একটু নিরিবিলিতে। ওই গোলপাহাড়ে অলসভাবে দুটো দিন কাটিয়ে আসুন।

বেঙ্গল টাইমস

১৫ আগস্ট, ২০২৩

ISSN 2445-5657

bengaltimes.in